সুশোভন সরকারের রবীন্দ্রচর্চা

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

''আমাদের বন্ধুমহলে একটা কথা প্রচলিত হয়েছিল যে বিশ্বভারতী মানে বিশ্ব বা রথী। ...বিশ্বভারতী না থাকলে রবীন্দ্রনাথের নামই বা আজ কে মনে রাখত।''

পুলিনবিহারী সেনের চাপে পড়ে সুশোভন সরকার লেখেন ''রবীন্দ্রনাথ : কিছু স্মৃতি''। স্বল্প-কলেবর স্মৃতিকথায় সুশোভনবাবু জানিয়েছেন, ''আমি কিন্তু কখনই রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর মধ্যে পড়তাম না। তাঁকে দেখেছি খানিকটা বাইরে থেকে। তা ছাড়া আমার চোখে তাঁর কিছু দুর্বলতারও পরিচয় পেয়েছিলাম। এ সব লেখা কি সঙ্গত?'' পুলিনবাবু তাঁকে জানান, ভালমন্দ যা কিছু মনে হোক, ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের কাছে তাই অমূল্য হয়ে উঠবে।

১৯৮২ সালে গ্রন্থাকারে স্মৃতিকথাটি প্রকাশিত হওয়ার আগে 'দেশ' পত্রিকায় সেটি বেরিয়েছিল। 'দেশ'-এর পাঠকেরা স্মৃতিচারণে কয়েকটি ভুল নির্দেশ করলে, সুশোভন সরকার (১৯০০-১৯৮২) কিছু তথ্য সংশোধন করেছিলেন, কিছু ভুল স্বীকার করতে রাজি হন নি। যেমন, অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়ের ডাক নাম, আকুশী, আঁকশি নয়। অরুন্ধতীর এক হাতে একটা বেশি আঙ্গুল ছিল, যার থেকে নাম হয় একুশ থেকে আকুশি। হতে পারে, কিন্তু রানী চন্দ তাঁর 'সব হতে আপন' বইয়ে অরুন্ধতীকে আকশি বলেই পরিচিত করেছেন। শান্তিনিকেতনে তিনি আকশি বলেই পরিচিত, শান্তিনিকেতনের একদা ছাত্র এবং অধ্যাপক অমিতাভ চৌধুরী আকুশি নয়, আঁকশি বলে খুব একটা অন্যায় করেন নি।

কবির বড়ো মেয়ে মাধুরীলতা মারা যান ১৬ মে ১৯১৮ ভবানীপুরের এক ভাড়া বাড়িতে, ১৭/১ ডিহি শ্রীরামপুর রোডে। মেয়ের সঙ্গে দেখা করে, ভবানীপুর থেকে বাড়ি ফেরার পথে, ৬১ নং হ্যারিসন রোডে ডাক্তার নীলরতন সরকারের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ আসার পর তাঁকে সুশোভনবাবু প্রথম দেখেন, এটা খুবই সম্ভব। এই তথ্য নিয়ে তাঁর লজ্জিত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ একদিনের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে নাম লিখিয়েছিলেন। এটা লেজেণ্ড মাত্র, কারণ তিনি এনট্রান্স পাস করেন নি, সুশোভনবাবু এটাকে লেজেণ্ড বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩ বছরের সমাবর্তন উৎসবে, সমাবর্তন ভাষণে, তিনি ঐ কলেজে যোগ দেন 'বহিরঙ্গ ছাত্র' হিসেবে, তবে ছাত্রদের র‍্যাগিং সহ্য করতে না পেরে দ্বিতীয় দিন যান নি। পরবর্তী সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ম্যাগাজিনে বারবার সগৌরবে স্মরণ করা হয়, রবীন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সির ছাত্র, সেটাকে সুশোভনবাবুর লেজেণ্ড বলে বরবাদ করার কোনো কারণ নেই।

রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলা সুশোভনবাবুর পছন্দ নয়। তাঁর বিরক্তিতে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ 'কবি' বলে ডাকতেন। সেটাও তাঁর পছন্দ হয় নি। তিনি কী বলে ডাকতেন বা ডাকলে খুশি হতেন, তার আভাসও দেন নি। তিনি বোধহয় জানতেন না, রবীন্দ্রনাথ নিজেও গুরুদেব আখ্যা পছন্দ করেন নি। পরিণত বয়সে 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থের এক প্রবন্ধে তিনি যেমন বলেছেন, ''তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীর কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে।''

আসতে যেতে রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো নেওয়াও সুশোভনবাবুর কাছে বিরক্তিকর লাগত। বাঙালি ঐতিহ্য, গুরুজনের পায়ের ধুলো নিয়ে আশীর্বাদ চাওয়া, এতে অশোভন কী আছে!

বার্ধক্যের কারণেই সুশোভনবাবুর স্মৃতিভ্রম হয়েছিল যখন তিনি লেখেন, 'আমাদের ঢাকা প্রবাসের শেষের দিকে... সঙ্গে ছিল অনেক রেকর্ড। প্রশান্তের ছোট ভাই প্রফুল্লচন্দ্র (বুলাদা) তখন শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের রেকর্ড তোলাতে ব্যস্ত। আমাদের কাছে ছিল দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাবিত্রী কৃষ্ণণ, অমিতা সেন প্রভৃতির গান।' সুশোভনবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেন, জানিয়েছেন, ১৯২৯-এর আগস্ট থেকে ১৯৩২-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত। সেই সময় তিনি অমিতা সেনের গান কোথায় পেলেন? অমিতার গান রেকর্ড হয়েছিল ১৯৩৫-৩৯ এর মধ্যে কিন্তু সেই সব রেকর্ড দুর্নিরীক্ষ্যকারণে রবীন্দ্রনাথ আটকে রেখেছিলেন ১৯৪০ পর্যন্ত। ১৯৩২-এ সাবিত্রীর গানের রেকর্ড পাওয়াও অসম্ভব। চণ্ডীচরণ সাহা

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

বিলেত থেকে ফিরে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানির শুরু করেন ১৯৩২-এ। হিন্দুস্থান রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির রেকর্ড করে ৬ এপ্রিল ১৯৩২ আর দুটো গানের (আমার পরাণ লয়ে / হৃদয় আমার নাচে রে) রেকর্ড করে ১৫ এপ্রিল ১৯৩২। এর পরে তারা করে সাবিত্রী কৃষ্ণণের গানের রেকর্ড। (তুমি কিছু দিয়ে যাও / শুভ্র প্রভাতে পূর্ব গগনে) যেটা বাজারে আসার সম্ভাবনা ১৯৩২-এর শেষে। সাবিত্রীর রেকর্ড সুশোভনবাবু ঢাকায় পেতেও পারেন, অমিতা সেনেরটা অসম্ভব।

এসবই অবশ্য অকিঞ্চিৎকর বিভ্রান্তি। কিন্তু যেটা মোটেও বার্ধক্যজনিত মন্তব্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, সেটা সুশোভনবাবুর রথীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য : বিশ্বভারতী না থাকলে রথী ঠাকুরের না কে-বা মনে রাখত। রথীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর কী আশা ছিল? তিনিও কি সুধীরঞ্জনের মতো প্রত্যাশা করেছিলেন, শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর ছাত্ররা সবাই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা পাবেন?

সুধীরঞ্জন দাস (১৮৯৪-১৯৭৭) শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম দিকের ছাত্র। ব্যারিস্টারি পাশ করে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হন। সুপ্রীম কোর্ট থেকে অবসর নিয়ে তিনি ১৯৬১-৬৬ সালে বিশ্বভারতীর উপাচার্য হন। 'আমাদের শান্তিনিকেতন' (১৯৫৯) বইয়ে তিনি লিখেছেন, ''গুরুদেব কখনো চান নি যে তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছেলেরা কেবল পাস করবে ও অর্থই উপার্জন করবে।'' তবুও, তিনি তাঁর আশ্রমজীবনের সতীর্থদের প্রতিষ্ঠা লাভের কথা লিখতে ভোলেন নি। উদাহরণ :

– ''সোমেন্দ্র (দেববর্মণ) আমেরিকা থেকে ডিগ্রি নিয়ে ফেরার পর ত্রিপুরা-দরবারে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হয়েছিলেন।''

– ''বিষ্ণুদার (বিশ্বেশ্বর বসু) মেজ ভাই বীরেনও এসে জুটলেন আমাদের ক্লাসে, ক্ষিতিবাবু তাঁর নামকরণ করলেন 'শিশু'... বীরেন পরে অ্যাটার্নি হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে বেশ পশার জমিয়েছেন।''

– ''ব্রজেন্দ্র শ্রীরামপুরের উইভিং কলেজের সর্বাধ্যক্ষ হয়েছিলেন।''

– ''ক্ষিতিবাবুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় এসেছিলেন তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র বীরেন ও ধীরেন। ...পরে (বীরেন) তিনি বি.এম. সেন নামে খ্যাত হয়ে কনট্রাক্টর ও ইঞ্জিনিয়ার রূপে প্রচুর পশার-প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। ...ধীরেন ...লণ্ডন থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি পেয়ে বিশ্বভারতী শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ পদে কয়েক বছর কাজ করার পর এখন তিনি পশ্চিম-বাংলা সরকারের শিক্ষাসচিব হয়ে যশস্বী হয়েছেন।''

– ''ক্ষিতিবাবুর শ্যালক প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত, যাঁকে আমরা পিলু বলেই জানি ...বিহারের সমবায় সমিতির চীফ অডিটার হয়েছিলেন।''

– ''প্রদ্যোৎ (সেনগুপ্ত) মন্দিরে গুরুদেবের উপাসনা এবং উপদেশ লিখে নিয়ে গুরুদেবকে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিতেন।... আয়কর-কমিশনরের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে এখন তিনি বিশ্বভারতীর সেবায় ও পক্ষীতত্ত্বের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন।''

– ''তপন (তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথের দৌহিত্র) শান্তিনিকেতন থেকে আমাদের পরের পছর প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভ করে বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন। পরে তিনি পশ্চিম-বাংলা সরকারের অ্যাডমিনিস্ট্রেটার-জেনারেলের পদে নিযুক্ত হয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ...তপন এখন (১৯৫৯) বিশ্বভারতীর কাজে নিজের শ্রম ও সময় ব্যয় করছেন শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও।'' তপন তখন বিশ্বভারতীর উপাচার্য।

– তরুণ ছিলেন তামাকের টিকের মতো মিশকালো... অনেকে তাকে ডাকত টিকে রায় বলে। ... পরে বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে তরুণ কলকাতা করপোরেশনের উচ্চপদ লাভ করেছিলেন।''

– ''আমার ভাই নিশীথরঞ্জনও কিছুদিন আশ্রমে বাস করে গেছেন। ...পরে গ্লাসগো থেকে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ডিগ্রি নিয়ে দেশে আসেন। এখন তিনি ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদে অধিষ্ঠিত আছেন।''

– ''মুকুল দে থাকতেন 'বাগান' বাড়িতে। ...বিলেত থেকে এচিং ভালোরকম আয়ত্ত করে ফিরে এসে কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হন।''

– ''পমথ বিশীও আসেন এই সময়ে অত্যন্ত ছোটো বয়সে। ...এখন তিনি সাহিত্যে প্রথিতযশা।''

– ''ক্ষিতীশ (রায়) ইউরোপে শিক্ষা পেয়ে আমাদের দেশের একজন কৃতী ভাস্কর বলে প্রখ্যাত হয়েছেন।''

– ''শশধর (সিংহ) কৃতী ছাত্র। লণ্ডনের পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে ভারত সরকারের প্রকাশন বিভাগে অধ্যক্ষ ছিলেন।''

১৯০৪-৫ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র ছিলেন সুধীরঞ্জন দাস, মধ্যে এক বছর বাদ দিয়ে। সেই সময়কার সতীর্থদের স্মৃতিচারণ করার সময় তাঁদের অনেকের ব্যবহারিক জীবনে প্রতিষ্ঠার কথা তিনি গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। সুশোভনবাবু যখন বলেন, বিশ্বভারতী ছাড়া রথী ঠাকুরকে কে চিনত, তখন মনে হয় তিনি ভাবতেন, অন্যদের মতো রথীন্দ্রনাথ তেমন প্রতিষ্ঠা পান নি। যদিও সুধীরঞ্জন তাঁর সময়ে রথীকে পান নি আশ্রমে, – ১৯০৫ সালে এন্ট্রান্স পাশ করে রথী আশ্রমেই আছেন আমেরিকা যাওয়ার প্রাক্কালে, – সুধীরঞ্জন লিখেছেন।

– ''রথীদা শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর কর্মসচিব হয়ে বহু বৎসর আশ্রমের পূর্ণ দায়িত্ব বহন করেছেন এবং বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলে আইন দ্বারা ঘোষিত হলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য পদে বৃত হয়েছিলেন।''

স্বাধীন ভারতে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু শান্তিনিকেতনের অনেককেই দিল্লিতে নিয়ে গিয়েছিলেন – অনিলকুমার চন্দ (মন্ত্রী), কৃষ্ণ কৃপালনী (সাহিত্য আকাদেমির সভাপতি), সুরেন্দ্রনাথ কর এবং নন্দলাল বসু দিল্লির বিভিন্ন কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন। তিনি রথীন্দ্রনাথকেও চেয়েছিলেন ভারতের কোনো রাজদূতের দায়িত্ব দিতে। রথীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী ছাড়েন নি।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

১৯২০-এর দশকে চিত্তরঞ্জন দাস চেয়েছিলেন, রথী বাংলাদেশের বিধানসভার সদস্য হন। রাজশাহী ডিভিশন থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে পারেন রথী, এমন ব্যবস্থাও করেছিলেন। নবজাত বিশ্বভারতী ছেড়ে রথী যান নি।

রথীন্দ্রনাথ হতে চেয়েছিলেন বিজ্ঞানী। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন ছাত্র, তখন জগদীশচন্দ্র বসুকে আনিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে। জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার সঙ্গে যন্ত্রের ব্যবহারে সাহায্য করেছিলেন রথী। অবলা বসু রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, রথীর উৎসাহ ও কাজ করবার ক্ষমতায় জগদীশচন্দ্র অনেক বক্তৃতার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, পাঁচ ছয়টার বেশি আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন নি। ১৯১৭ সালে 'বসুবিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা হলে জগদীশ চেয়েছিলেন রথীকে সেখানে বিজ্ঞানকর্মী হিসাবে। রথীরও উৎসাহ ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রথীকে ছাড়েন নি।

১৯১২-১৩ সালে রথীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকায়, রথী তাঁর পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় ইলিনয়-তে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি শেষ করার জন্য তৈরি হচ্ছেন। কিন্তু রথীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আবার ইংল্যাণ্ডে আসতে বাধ্য করলেন, কারণ রথী-প্রতিমা ছাড়া এককভাবে চলাফেরায় তিনি অক্ষম।

আমেরিকা থেকে কৃষিবিদ্যার স্নাতক হয়ে রথী জার্মানির গ্যেটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন স্নাতকোত্তর পড়াশুনার জন্য। কিন্তু বাবার অসুস্থতার জন্যে সেই পাঠ শেষ না করেই তিনি দেশে ফেরেন ১৯০৯ সালে। শিলাইদহ অঞ্চলে তাঁর নবার্জিত কৃষিবিদ্যা প্রয়োগ করছেন যখন রথী পূর্ণোদ্যমে, তাঁকে সেখান থেকে তাঁর বাবা সরিয়ে আনলেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে, যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রশাসনে চান আস্থাভাজন কাউকে।

কলকাতায় জোড়াসাঁকো বাড়িতে ১৯১৫ সালে রথী শুরু করলেন 'বিচিত্রা ক্লাব' - যেটা হয়ে উঠতে যাচ্ছিল নতুনধারার শিল্প আন্দোলনের শুরু, আর্ট-ক্রাফ্‌ট আন্দোলনের নতুন দিক, - দেশজ কারুশিল্প সংগ্রহ যখন পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ হয়েছে, তিন চার বছরের মাথায় রবীন্দ্রনাথ রথীকে টেনে নিলেন শান্তিনিকেতনে, বিশ্বভারতী তৈরীর কাজে।

১৯১৭ সালে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানমন্দিরে যোগ দিতে না পেরে রথী চেয়েছিলেন আর্বানায় ফিরে যেতে। জমিদারির আয়ে জীবনযাপনের চাইতে পেশাদার বিজ্ঞানী হয়ে উঠতে - কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ নেই।

আমেরিকা থেকে ৩০ নভেম্বর ১৯২০ রবীন্দ্রনাথ চিঠি লেখেন অ্যান্ডরুজকে, যার একটি খবর : Rathi and Bauma have come at last. I am greatly relieved for the ideas that float in my mind's sky in a vaporous condition are attracted and precipitated into showers by concrete through power of Rathi.

লঘু সুরে বলা হলেও, রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনে রথীন্দ্রনাথের অবদান বুঝতে হলে, অ্যান্ডরুজকে বলা কথাগুলো গানের ধুয়ার মতো বারেবারে ফিরে আসবে। বেড়াতে যাওয়ার সময় টিকিট কাটা আর টিকিট ক্যানসেল করাই রথীর একমাত্র কাজ ছিল না, রবীন্দ্রনাথের অনেক বায়বীয় ধারণাকে বৃষ্টিতে পরিণত করত রথীন্দ্রনাথের ব্যবহারিক জ্ঞান। সেটা শান্তিনিকেতনে green architecture-এ যেমন, শিলাইদহে ট্র্যাকটরের চাষেও তেমন, শান্তিনিকেতনে wind mill চালানোয় যেমন, জোড়াসাঁকো 'বিচিত্রা ক্লাবে' utility art-এর প্রসারেও তেমন। ১৯১৫ সালে রথী যে বিচিত্রা ক্লাব গড়ে তুলেছিলেন জোড়াসাঁকোর লাল বাড়িতে, গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্রের সান্নিধ্যে যেখানে শিল্পকলা চর্চার আর একটা ঢেউ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চা, সংগীতচর্চা, নাট্যচর্চা নতুন এক আন্দোলনের শুরু হলো, দেখা দিল নতুন ডিজাইনের আসবাবপত্র, কিন্তু ওদিকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনার প্রসারে বিশ্বভারতীর আভাস এসে পড়েছে। ফলে আবার ডাক পড়ল রথীর - বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে, আশ্রম চালানোর হিসেবনিকেশে হাল ধরতে। অর্গানাইজেশন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের তাত্ত্বিক বিরূপতা থাকতে পারে, কিন্তু একটা সংস্থার প্রশাসনে অর্গনাইজেশন অনিবার্য - যেটার হাল বারেবারে ধরতে হয়েছিল রথীন্দ্রনাথকে।

সুশোভনবাবু লিখেছেন, তাঁদের পরিবারে রাবীন্দ্রিক প্রভাবে তিনি বড়ো হয়েছেন, গান শুনে কবিতা পড়ে। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, মুকুল রায়েরা যখন ১৯১৮-১৯ সালে তরুণ ব্রাহ্ম আন্দোলন শুরু করেন সুশোভনবাবু সেই আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর কনস্টিটিউশন লেখা হলে, উদ্বোধন মন্ত্রের ইংরেজি তর্জমাতে অংশ নেন তিনি। বিশ্বভারতীর কার্যালয় একটি ছিল কলকাতায়। কেননা তার যুগ্ম সচিব প্রশান্তবাবু কলকাতায় থাকেন। বিশ্বভারতীর প্রসারের জন্য যে বিশ্বভারতী সম্মিলনী তৈরি হয়, সেটাও ছিল কলকাতায়। সুশোভনবাবু এই সব কাজে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৩-২৫ সময়টা অক্সফোর্ডে কাটিয়ে সুশোভনবাবু কলকাতায় ফিরে এসেছেন, বিশ্বভারতী সংসদে এবং পরে বিশ্বভারতী কর্মসমিতির সদস্য হন। প্রশান্তচন্দ্রের বোন রেবাকে বিয়ে করবেন সুশোভনবাবু, সেই সূত্রে শান্তিনিকেতনে তাঁর যাওয়া-আসা বেড়ে যায়, কেননা রেবা শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। এই সময়টাতেই আসতে-যেতে গুরুদেবকে প্রণাম করাটা সুশোভনবাবুর দৃষ্টিকটু এবং শ্রুতিকটু লাগত।

সুশোভনবাবুর রথীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিরূপ হওয়ার একটা কারণ, রথী বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয় কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যান। শান্তিনিকেতন বনাম কলকাতা, এমন একটা ধারণা গজিয়ে উঠতে থাকে এবং রথী এক একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে থাকেন, যার সঙ্গে সুশোভনবাবু শুধু একমাত্র নন, তা না, বিরুদ্ধমত এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বভারতী সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন।

আমাদের অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠেন সুশোভনবাবু যখন একটি ঘটনার উল্লেখ করেন তিনি, অথচ স্পষ্ট করে বলেন না, ঘটনাটি কী ছিল। ঘটনাটি কবেকার? তিনি বলেছেন "মনে হয় ১৯৩৬ সালে।" ১৯৩৬ সালে নয়, ১৯৩৪ সাল। উপলক্ষ্য, "নারী ভবনের অধিকর্ত্রী হেমবালা সেনকে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে।" কেন? সুশোভনবাবু জানেন নি। তিনি

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

শুনলেন, সংসদের অধিবেশনে সেদিন রবীন্দ্রনাথ থাকবেন। শেষের দিকে, ব্যস্ত রবীন্দ্রনাথ সংসদে আসতেন না, কিন্তু, সুশোভনবাবুর সন্দেহ, সংসদ রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে হেমবালাকে ছাড়াবে। রবীন্দ্রনাথ কি হেমবালাকে ছাড়াতে চান, না চান না? সুশোভনবাবু বলেন নি। তাঁর ইঙ্গিত, বৃদ্ধ কবিকে সামনে রেখে সংসদ কর্তারা চেয়েছিলেন, এ বিষয়ে কোনো আলোচনা ছাড়াই হেমবালাকে বরখাস্ত করা হোক। কিন্তু সুশোভনবাবু তাঁর প্রতিবাদ জানান তীব্রভাবেই, রবীন্দ্রনাথ সেটা পছন্দ করুন আর না-ই করুন। এবং হেমবালাকে বরখাস্ত করা হলে, সুশোবনবাবু বিশ্বভারতী সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও তাঁর রবীন্দ্রজীবনীতে স্পষ্ট উল্লেখ করেন নি, হেমবালাকে কেন ছাড়িয়ে দেওয়া হলো। তিনি বলেছেন, হেমবালা ছুটিতে চলে গেলেন, আর ছুটি থেকে কাজে ফিরে আসেন নি, যদিও শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছিলেন।

হেমবালা সেন ঢাকার ব্রাহ্ম প্রচারক ঈশানচন্দ্র সেনের মেয়ে। পাঁচ ভাই বোনের একজন, হেমবালা বিয়ে করেন নি। ১৯২৩ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে ছাত্রীদের আবাস, শ্রীভবন-এর কর্ত্রী হয়ে আসেন যখন তাঁর পূর্বসুরী স্নেহলতা সেন এক বছরের ছুটি নিয়ে চলে যান। স্নেহলতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছের মানুষ। আই সি এস বিহারীলাল গুপ্তের মেয়ে, বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা, ইংরেজি কয়েকটি গল্পের বইয়ের লেখিকা, এবং যাঁর বিয়েতে রবীন্দ্রনাথ গানও লিখেছিলেন। কলকাতার নাগরিক জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯২১-এর পুজোর ছুটির পরে। কিন্তু এক বছর না যেতেই তিনি ছুটি চান আর ছুটি থেকে ফিরে আসেন নি। হেমবালাকে একশো টাকায় নিয়োগ করা হয়, অবশ্যই অস্থায়ী ভাবে, কেননা স্নেহলতা চাকরি ছাড়েন নি, ছুটি নিয়েছিলেন। হেমবালা স্থায়ী পদ পান, স্নেহলতার না ফেরার কারণে, এর পরে তিনি এগারো বছর ছিলেন শ্রীভবনের তত্ত্বাবধায়িকা হিসেবে।

হেমবালা সম্পর্কে আশ্রমিকদের যে স্মৃতিচারণ পাওয়া যায়, এসবই কঠিন শৃঙ্খলার পক্ষপাতী এক মহিলার এবং সেই সূত্রে নানান মজার কাহিনির। ১৯৩১-এ শান্তিনিকেতনে অধ্যাপিকা হয়ে আসেন লীলা মজুমদার, তিনি ছিলেন শ্রীভবনেরই আবাসিকা। এক অধ্যাপককে ষাঁড়ে তাড়া করলে, অধ্যাপকটি শ্রীভবনে আশ্রয় নেন, কিন্তু নিয়মের নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে কাউকে কর্ত্রী শ্রীভবনে পা রাখতে দেবেন না - একদিকে ষাঁড়ের ফোঁসফোসানি, আর এক দিকে আবাসন-কর্ত্রীর তর্জনগর্জন, অধ্যাপকের অবস্থা দেখে লীলা মজুমদার হেসেই অস্থির। শেষ পর্যন্ত, গয়লা এসে ষাঁড়কে নিয়ে গেলে শান্তি। হেমবালাকে নিয়ে আর একটি গল্প বহুকথিত। রাত্রিবেলা হেমবালাকে ভয় দেখানোর জন্য মীরা দেবী, প্রতিমা দেবী, সুধীরা দেবী (নন্দলাল বসুর স্ত্রী), কমলা (দিনেন্দ্রনাথের স্ত্রী) এবং আরো কয়েকজন ডাকাত সেজে শ্রীভবনে চড়াও হয়ে নিজেরাই পালিয়ে বাঁচেন, যখন ছাত্রীরা কেউ কেউ ডাকাতদের চুল ধরে টানাটানি করায় পরচুলা খসে পড়ে। ছাত্রীদের বজ্র-আঁটুনিতে প্রতিমা দেবীর বাহুতে কালসিটের দাগ পড়ে যায়।

তখনকার শ্রীভবন ছিল অরক্ষিত একটা বাড়ি, মাঠের মধ্যে। গরাদহীন বড়ো বড়ো জানলা, কোনো বাউন্ডারি ওয়াল নেই। নিরাপত্তার জন্য যখন হেমবালা গুরুদেবের কাছে বাড়ি ঘেরা দেয়াল চান, গুরুদেব অসন্তুষ্ট হন, তিনি মেয়েদের জেলখানায় রাখতে চান না। মেয়েদের এই নতুন বাড়িতেও হেমবালা আসতে চান নি, গরাদহীন জানলা বলে - রেগে গিয়ে গুরুদেব বলেছিলেন, তাহলে ওটা ছেলেদের দিয়ে দেবেন।

অমিতা ঠাকুর (১৯১০-১২৯২), দ্বিজেন্দ্রনাথের নাতবউ যিনি হেমবালাকে কাছ থেকে দেখেছেন, তিনি হেমবালা নব্বই বছর বয়সে আসানসোলে মারা গেলে একটি শোকরচনায় হেমবালার কথা স্মরণ করেছেন। সেটা ছাপা হয় শান্তিনিকেতনের আলাপিনী সদস্যদের মুখপত্র 'শ্রেয়সী' পত্রিকায় ১৩৯৮-র (১৯৯১ সালে)। সেই হিসেবে হেমবালার জন্ম ১৯০১ সালে। কিন্তু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনীতে তাঁর জন্মসাল বলেছিলেন ১৮৯৪ সালে, যদিও জিজ্ঞাসাচিহ্ন দিয়ে। প্রভাতকুমার জানিয়েছেন, হেমবালা ঢাকা ইডেন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করে সেই স্কুলেই শিক্ষকতা করেন। ১৯১৭ সালে হেমবালা বি.এ. পাস করেন। তারপর ভিক্টোরিয়া স্কুল, পরে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে কাজ করে ১৯২৩-এ শ্রীভবনের সঙ্গে যুক্ত হন। অমিতা ঠাকুরের ধারণা, হেমবালা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, শান্তিনিকেতনের আর্টিস্ট হরিপদ রায়ের সূত্রে।

দীর্ঘ এগারো বছর হেমবালা সেন ছিলেন ছাত্রী নিবাসের কর্ত্রী। শান্তিনিকেতনের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় হয় ১৯০৮ সালে, সেটা দু-বছর পরে বন্ধ হয়ে যায়, একটি ছাত্র আত্মহত্যা করলে। বালিকা বিদ্যালয় ঠিক কী কারণে বন্ধ হয়ে যায়, সেটা অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হয় নি। তবে যে দু-বছর ছিল, তখনও ছাত্রীনিবাস চালাতে কর্তৃপক্ষের হিমসিম খেতে হয়েছিল। অজিতকুমার চক্রবর্তীর মা সুশীলা দেবী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মা গিরিবালা দেবী, মোহিতচন্দ্র সেনের স্ত্রী সুশীলা দেবী - এঁদের কারো ছাত্রীনিবাস চালানোর অভিজ্ঞতা ছিল না। নিয়মকানুন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতেও সঙ্কোচের কারণে, দুই বছরেই তিনবার কর্ত্রী পালটাতে হয়। দীর্ঘকাল পরে ছাত্রীনিবাস আবার শুরু হলে, স্নেহলতা সেনও এক বছরের বেশি থাকতে পারেন নি। সেই অবস্থায় হেমবালা এগারো বছর কর্ত্রী ছিলেন। তাঁর কঠিন শৃঙ্খলা রবীন্দ্রনাথ সব সময়ে অনুমোদন করেন নি বটে, আবার বিদেশে থেকে হেমবালাকে নানান ইচ্ছা জানিয়েছেন ছাত্রীদের শিক্ষার সম্পর্কে। হেমবালা ১৯৩৩ সালে ছুটি চাইলে কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেন। তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে, এমন কথা প্রভাতকুমার জানান নি। কিন্তু হেমবালা কেন ছুটি চাইলেন, সেটাও স্পষ্ট বলেন নি। হেমবালা এর পরেও শান্তিনিকেতনে মধ্যে মধ্যে এসেছেন, তাঁর দাদা বৌদি আশ্রমেই ছিলেন। তাহলেও, অমিতা ঠাকুর ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন, হেমবালা বিদায়ক্ষণে সামান্য সহায়তাও পান নি। কর্তৃপক্ষ ঠিক কী কারণে বিরূপ হয়েছিলেন, সেটা স্পষ্ট কেউই বলেন নি, যদিও রবীন্দ্রনাথ তার পরেও শুভকামনা করে হেমবালাকে চিঠি লিখছেন।

হেমবালাকে ছুটিতে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল, না, তিনি স্বেচ্ছায় ছুটিতে যান? এই সময়ে শান্তিনিকেতনে শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিক ছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর বয়স তখন ৪২। কী ঘটেছিল,

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

সেটা তাঁর জানার কথা, কারণ হেমবালার কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁর স্ত্রী সুধাময়ীকে। হেমবালা যে শুধুই শ্রীভবনের কর্ত্রী ছিলেন, তা নয়। প্রভাতকুমার লিখেছেন, হেমবালা শান্তিনিকেতনের বিরাট রন্ধনশালা, আশ্রম-সংলগ্ন গোশালা, ঢেঁকিশাল তত্ত্বাবধান করতেন। হেমবালা চলে যাওয়ার পরে এই সব বন্ধ হয়ে যায়, কারণ দায়িত্ব নেওয়ার লোক নেই। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের পুরো সহানুভূতি ছিল হেমবালার প্রতি। হেমবালাকে যে সরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে, বিকল্প হিসাবে সুধাময়ীকে ভাবা হচ্ছে সেটা দেখা যাচ্ছে ইন্দিরাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ১৮ চৈত্র ১৩৪০ তারিখে লেখা চিঠি থেকে। হেমবালাকে রবীন্দ্রনাথ ৬ বৈশাখ ১৩৪১ চিঠি লিখে জানাচ্ছেন, শান্তিনিকেতন থেকে কিছুদিন দূরে থাকলে হেমবালার ভালোই হবে। ১৪ আষাঢ় ১৩৪১ (২৯ জুন ১৯৩৪) হেমবালাকে রবীন্দ্রনাথ জানালেন, ''এখানে নানা প্রয়োজনবশত নূতন ব্যবস্থার কারণ ঘটেছে। সেই কথা জেনেই তোমার ছুটি নেবার কথার অনুমোদন করতে হয়েছে। এই ব্যবস্থান্তরে আমার হৃদয় ব্যথিত।''

নূতন ব্যবস্থার কারণ কী রবীন্দ্রনাথ লেখেন নি। প্রভাতকুমারও ''ছোটোখাটো ঘটনায় এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়'' যে হেমবালা ছুটিতে যাওয়াই মনস্থ করলেন, এর বেশি কিছু লেখেন নি। সংসদে হেমবালাকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এমন কোনো আভাস পাওয়া যাচ্ছে না প্রভাতকুমারের বিবরণ থেকে।

সুশোভনবাবু স্পষ্ট করে বলেন নি, হেমবালা সেনকে বরখাস্ত (?) করার পিছনে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ। বিধুশেখর শাস্ত্রী সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি সোজাসুজিই জানালেন, রথীই বিধুশেখরকে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু কী কারণে বিধুশেখর বিশ্বভারতী ত্যাগ করেন, ১৯৩৭ সালে সুশোভনবাবু কি সেটা জানতেন? ক্ষিতিমোহন সেনের মেয়ে অমিতা সেন তাঁর 'আনন্দ সর্ব কাজে' স্মৃতিচারণায় স্পষ্ট বলেছেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী কেন বিশ্বভারতী ছেড়ে দিলেন, সে বিষয়ে লোকে ভুল কথা বলে। অমিতার মতে, ঘটনাটি হলো এই – বিশ্বভারতীর কোনো অধ্যাপক ছাত্রীর সঙ্গে অশোভন সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে পড়লে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু, তদবির করে যান সেই অধ্যাপক এবং তাঁর পদ ফিরে পান। বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রতিবাদ করে বিশ্বভারতী ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনেই আছেন, – তিনি শাস্ত্রীমশাইকে আটকানোর চেষ্টা করেন নি। রথীর দায়িত্ব কতটুকু, সে বিষয়ে অবশ্য সুশোভনবাবু নিঃসন্দেহ। যদিও শাস্ত্রীমশায়ের বিদায় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রথীকে লিখছেন ১৮ এপ্রিল ১৯৩৫ : শেষ মানুষ ছিলেন শাস্ত্রীমশায়, তিনিও চলে গেলেন। আদর্শে গভীরতা আছে এমন মানুষ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কথাগুলো লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের শেষকৃত্য হয় কলকাতায়, রথীর নির্দেশে। বাইশে শ্রাবণ সুশোভনবাবু জোড়াসাঁকোতে ছিলেন সকাল থেকেই। দুটো কারণে তিনি বিরক্ত। রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়া হলো না কেন। যখন ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এক বড়কর্তা নিবারণ ঘোষের সেলুন করে স্পেশাল ট্রেনে কবির মরদেহ শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। তাহলে যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে কবির শেষকৃত্য সম্পন্ন হতে পারত। সুশোভনবাবু নিশ্চয়ই জানতেন না, কবির শেষ নিঃশ্বাস পড়ার পরে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৮৩-১৯৬১) রথীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শেষকৃত্য কোথায় হবে? রথী চিরকুটে জানিয়েছিলেন,

শান্তিনিকেতনে নয়, কলকাতা
Crematorium নয়, নিমতলা।

১৯৪১ সালে কেওড়াতলা ক্রিমেটেরিয়াম তৈরি হয় নি, কলকাতায় একটা ক্রিমেটোরিয়াম ছিল স্ত্রীস্টানদের, পার্ক স্ট্রীটে। দেবেন্দ্রনাথের শেষকৃত্য নিমতলায় হয়েছিল, সেখানেই রবীন্দ্রনাথের দাহ হবে, এটাই স্বাভাবিক। এই ব্যাপারে, সুশোভনবাবু অন্যায়ভাবে সজনীকান্ত আর চারুচন্দ্রকে অভিযুক্ত করেছিলেন। চারুচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হলেও, বিশ্বভারতী সংসদে রথীর পরামর্শদাতা ছিলেন, রথীও এই বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপককে মান্য করতেন।

জোড়াসাঁকোতে নন্দলাল বসুকে খাট সাজাতে দেখে সুশোভনবাবু বিরক্ত হয়েছিলেন। ''রবীন্দ্রনাথ তখনও রয়েছেন, আর ওদিকে তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য খাট তৈরি হচ্ছিল।'' নীলরতন সরকারের আপত্তি অগ্রাহ্য করে বিধানচন্দ্র রায়ের পরামর্শে ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় অপারেশন করেন ৩০ জুলাই। তার পর থেকেই আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন কবি ৭ আগস্ট পর্যন্ত। ৫ আগস্ট নীলরতনবাবু এবং বিধানবাবু শেষ দেখা দেখে যান। সুতরাং ৭ আগস্ট সকাল বেলা খাট তৈরি না হলে, শেষ যাত্রা কখন হবে? ১২.২০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস, সাড়ে তিনটেয় প্রয়াণযাত্রা শুরু। যুদ্ধ চলছে, রাত্রিতে ব্ল্যাকআউট চালু – পুলিশের নির্দেশ ছিল সূর্যের আলো থাকতে থাকতেই যেন শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়, না হলে বিশৃঙ্খলা হবে। সুশোভনবাবুর এসব না জানার কথা নয়। অথচ তিনি লিখছেন, ''এই অবস্থায় সমস্ত ব্যবস্থাপনার কাণ্ডারী হয়ে দাঁড়ান সজনীকান্ত দাস এবং বোধ হয় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। এই কর্মকর্তারা বিধান দিলেন যে মারা গেলে সূর্যাস্তের আগে দাহ করা বিধেয়। অতএব খাট তৈরি।'' 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থে রাণী মহলানবিশ কবির জীবনের এই শেষ দিনটা নিয়ে, সজনীকান্ত দাসকে খলচরিত্র তৈরি করে, যে গল্প ফেঁদেছিলেন, সুশোভনবাবু সেটা বাছবিচার না করে বিশ্বাস করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ যে কদিন আচ্ছন্ন অবস্থায় কাটছিল, তখন অনবরত টেলিফোন আসছিল সংবাদপত্র, রেডিও, শুভার্থীদের কাছ থেকে কবির কুশল জিজ্ঞাসা করে। সাময়িকভাবে সজনীকান্ত একটি টেলিফোন কেন্দ্র তৈরি করেন এবং স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করেন টেলিফোন বার্তা দেওয়ার জন্য। রাণীর অভিযোগ, ভুয়ো টেলিফোন কল করে, রাণীকে সরিয়ে নেওয়া হয় অসুস্থ প্রশান্তচন্দ্রের বরানগর বাড়িতে। রাণীর স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল রাণীকে সজনীকান্ত সরিয়ে দেন। ভাবখানা এমন, রাণী জোড়াসাঁকো থাকলে কবির শেষকৃত্য শান্তিনিকেতনে করতে তিনি বাধ্য করতেন রথী-প্রতিমাকে। এমন অবাস্তব কল্পনা সুশোভন সরকার বিশ্বাস করেছিলেন। সত্যই তাঁর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় অগভীরই ছিল।

কালপ্রতিমা, ডিসেম্বর ২০১৫ পত্রিকার সৌজন্যে

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073